মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি

মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি

লেখক
খাজা হাসান নিজামী

নাশাত

মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি
লেখক : খাজা হাসান নিজামী

প্রথমপ্রকাশ : জুলাই ২০১৯
প্রথমসংস্করণ : নভেম্বর ২০২০

প্রকাশক

নাশাত পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

সর্বস্বত্ব © নাশাত

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

সূচিক্রম

বাহাদুর শাহ জাফর ।। ১৩
দিল্লিবাজারে ভিখারি শাহজাদা ।। ১৮
এতিম শাহজাদার গল্প ।। ২৩
সুলতানা বানুর দুঃখগাথা ।। ২৮
অভুক্ত শাহজাদার রোজা ।।৩১
বাহাদুর শাহের কন্যা ।। ৩৭
এতিম শাহজাদার ঈদ ।। ৪৪
দরদানার কাহিনি ।। ৪৯
ঠেলাগাড়িওয়ালা ।। ৫৯
একজন আতরপ্রেমীর গল্প ।।৬৬
ছবির সাথে কথা ।। ৭০
গুলবানুর কাহিনি ।। ৭৫
গুজব ও বিদ্রোহ ।। ৭৯
শাহজাদা যখন ঝাড়ুদার ।। ৮৫
জাকিয়া বিয়াবানি ।। ৮৮
কারাগারে দুই শাহজাদা ।। ৯৫
অচেনা বীরাঙ্গনা ।। ৯৯
চিন্তিত শাহজাদি ।। ১০৪
নারগিস নজরের কাহিনি ।। ১১১
এক শাহজাদির আর্তনাদ ।। ১১৭
মির্জা মোগলের মেয়ে লালা রুখ ।। ১২৬
এক প্রসূতির করুণ আর্তনাদ ।। ১৩০
ভিক্ষুক ।। ১৩৫
সাকির হাতে পানপাত্র ।। ১৩৭
যখন শাহজাদা ছিলাম ।। ১৩৯
খানসামা ।। ১৪৬

বাহাদুর শাহ জাফর

দিল্লির শেষ বাদশাহ[১] অনেকটা দরবেশ-প্রকৃতির ছিলেন। তার দরবেশি ও সাদাসিধা জীবনযাপনের বহু উদাহরণ আজও দিল্লি ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। দিল্লিতে এখনো এমন অনেকে বেঁচে আছে, যারা এই সাধক পুরুষকে দেখেছে এবং নিজ-কানে তার দরবেশি কথাবার্তা শুনেছে। বাহাদুর শাহ বড় ইবাদতগুজার বাদশাহ ছিলেন। রাষ্ট্রের কাজকারবার সব তো ইংরেজদের হাতেই ছিল; তাই আল্লাহর জিকির-আজকার আর দরবেশি কথাবার্তা ছাড়া তার কোনো ব্যস্ততা ছিল না। দরবার বসত নিয়মিত; কিন্তু সেখানেও তাসাউফের সূক্ষ্ম কথাবার্তা হতো। আধ্যাত্মিকজগতের রহস্যাবলির আলোচনা হতো। যখন দিওয়ানে আম কিংবা খাসে দরবার বসত, দরবারিরা অপেক্ষায় থাকত বাদশাহর আগমনের আর বাদশাহ তার মহল থেকে বের হওয়ার জন্য কদম ওঠাতেন তখন এক মহিলা নকিব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করত, 'হুশিয়ার, আদবকায়দা নিগাহদার।' মহিলা নকিবের কণ্ঠ দরবারের সকল পুরুষ নকিব শুনতে পেত। তখন তারাও বলে উঠত, 'হুশিয়ার, আদবকায়দা নিগাহদার।' এ ঘোষণা শোনামাত্র দরবারের সবাই নীরব হয়ে যেত এবং যার যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াত। সকল আমির এবং উজির তাদের দৃষ্টি নিচু করতেন। দরবারজুড়ে পিনপতন নীরবতা নেমে আসত। এই অবস্থায় বাদশাহ দরবারে আগমন করতেন এবং নিজের আসনে বসতেন। এক নকিব ঘোষণা দিত, 'জিল্লে এলাহি বর আমদ'—আল্লাহর ছায়া এসে গেছেন। এই ঘোষণা

---

[১]. সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর বা ২য় বাহাদুর শাহ (অক্টোবর ২৪, ১৭৭৫ — নভেম্বর ৭, ১৮৬২) শেষ মোগল সম্রাট। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল মুজাফফার সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ গাজি। তিনি ২৪ অক্টোবর ১৭৭৫ (মোতাবেক ২৭ শাবান ১১৮৯) সালে দিল্লির লালকেল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ও সম্রাজ্ঞী লাল বাইয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তার ঊর্ধ্বতন বংশতালিকা বিশতম স্তরে গিয়ে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের সাথে মিলেছে। সিপাহি বিপ্লবের শেষে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাহাদুর শাহ জাফরের জীবনী জানার জন্য দেখুন প্রফেসর আসলাম পারভেজ রচিত 'বাহাদুর শাহ জাফর'।

শুনে আমিররা এক এক করে বাদশাহর সামনে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দাঁড়াত। সেই স্থানকে 'জায়ে আদব' বলা হতো। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা তিনবার কুর্নিশ করত। কুর্নিশ শেষে প্রত্যেক আমিরের মর্যাদা অনুযায়ী তার জন্য কিছু শব্দ বলা হতো এবং তার দিকে বাদশাহর মনোযোগ আকর্ষণ করা হতো। ধারাবাহিকভাবে দরবারিরা সবাই বাদশাহর সামনে উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ করতেন। সব প্রথা-আচার পালন শেষ হলে বাদশাহ বলতেন, 'আজ আমি একটা গজল শোনাব।' এই বলে তিনি গজলের প্রথম পঙক্তি বলতেন। পঙক্তি শুনে একজন আমির উঠে দাঁড়াতেন। তিনি 'জায়ে আদবে' দাঁড়িয়ে বলতেন, 'সুবহানাল্লাহ। কালামুল মুলুক, মুলুকুল কালাম।' তারপর নিজের আসনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এভাবে প্রতিটি পঙক্তি উচ্চারণের পর একেকজন আমির জায়ে আদবে দাঁড়িয়ে বাদশাহর প্রশংসা করে আসতেন।

বাহাদুর শাহ লোকজনকে মুরিদও করতেন। কেউ তার মুরিদ হলেই তার জন্য মাসিক ৫ রুপি ভাতা নির্ধারিত হয়ে যেত। এ কারণে প্রচুর লোক তার মুরিদ হয়। কেউ কেউ বলেন, বাহাদুর শাহ মাওলানা ফখর সাহেবের হাতে বাইয়াত ছিলেন। কিন্তু মাওলানা ফখর সাহেবের যুগে বাহাদুর শাহের বয়স খুবই কম ছিল। তিনি বাইয়াত হয়েছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তার শৈশবে তাকে মাওলানা ফখর সাহেবের কোলে রাখা হয়েছিল। মাওলানা ফখর সাহেবের ইনতেকালের পর তার উত্তরাধিকারী হজরত মিয়া কুতুবুদ্দীন-এর সাথে বাহাদুর শাহ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাহাদুর শাহ তার হাতেই বাইয়াত ছিলেন। মিয়া কুতুবুদ্দীন সাহেবের ছেলে মিয়া নাসিরুদ্দীন উরফে মিয়া কালেশাহ-এর সাথেও বাদশাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তার এক মেয়েকে মিয়া কালেশাহর কাছে বিয়ে দেন। বাহাদুর শাহ পির-ফকিরদের মহব্বত করতেন, তাদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ রাখতেন, বিশেষভাবে খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে তার ছিল গভীর অন্তরঙ্গতা। প্রায়ই তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মাজারে উপস্থিত হতেন। আমার নানা হজরত শাহ গোলাম হাসান চিশতির সাথে বাহাদুর শাহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নানাজি প্রায়ই লালকেল্লায় যেতেন এবং বাদশাহর ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। বাল্যকালে আম্মাজান আমাকে বাহাদুর শাহের অনেক ঘটনা শুনিয়েছেন। এসব তিনি তার বাবার কাছে শুনেছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। বাহাদুর শাহের ব্যক্তিত্ব বুঝার মতো বয়স হয়নি। তবু এসব ঘটনা আমার মনে রেখাপাত করে। দুনিয়ার প্রতি একটা বৈরাগ্য ভাব সেই থেকেই আমার মনে জায়গা করে নেয়।

বাহাদুর শাহ আধ্যাত্মিক জগতের বিশেষ স্তরের মানুষ ছিলেন। বিদ্রোহের পূর্বেই তিনি কাশফের মাধ্যমে বিদ্রোহের ঘটনাবলি জেনে গিয়েছিলেন।[২]

শাহ আল্লাহ বখশ চিশতি সুলাইমানি যখন প্রথমবার দিল্লি আসেন, বাদশাহ তাকে লালকেল্লায় আমন্ত্রণ জানান। খাওয়া শেষে আল্লাহ বখশ সাহেবকে খাস কামরায় আনা হয়। বাদশাহ তার কাছে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ জানতে চান। আল্লাহ বখশ সাহেব বলেন, আমার দৃষ্টিতে আপনার পূর্বসূরিদের কিছু ভুলের মাশুল দিচ্ছে মোগল খান্দান। তাদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো, আশেক মাশুক তথা নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও আমির খসরুর মাঝখানে প্রাচীর তুলে দেওয়া। তাদের দুজনের কবরের মাঝের অংশে বাদশাহ মুহাম্মদ শাহকে দাফন করা হয়েছে। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে আমির খসরুর অত্যন্ত গভীর মহব্বত ছিল। এমনকি নিজামুদ্দীন আউলিয়া বলেছেন, শরিয়তের বাধা না থাকলে বলতাম আমাকে আর আমির খসরুকে এক কবরে দাফন করতে। উচিত ছিল তাদের ভালোবাসার প্রতি সম্মান জানিয়ে মাঝখানে কাউকে কবর না দেওয়া। এই দুজনের মাঝখানে মুহাম্মদ শাহকে দাফন করে গর্হিত কাজ করা হয়েছে। আর আপনাদের সাম্রাজ্যকেও পতনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আমার নানাজান বলেছেন, আল্লাহ বখশ সাহেবের এই কথা বাহাদুর শাহের অন্তরে দাগ কাটে। মোটকথা বিভিন্ন কারণেই বাহাদুর শাহ জাফর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আভাস পান। ঘরোয়া মজলিশগুলোতে তিনি প্রায়ই এসব বলতেন।

বাহাদুর শাহ যখন নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মাজারে উপস্থিত হতেন তখন এক ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হতো। বাদশাহ পৌঁছার আগেই মাজারে ভিড় জমে যেত। বাদশাহর সওয়ারি মাজারে পৌঁছলে শোর উঠত—'বাদশাহ এসেছেন, বাদশাহ এসেছেন।' সবাই ভিড় থেকে সরে জায়গা করে দিত। মাজার পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য জায়গা খালি করে দেওয়া হতো। বাদশাহ ভিড়ের মাঝ দিয়ে সরাসরি মাজারে চলে যেতেন। জিয়ারত শেষে মাহফিলে

---

[২] অদৃশ্য জগতের কোনো কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশফ বলা হয়। এ কাশফ কখনো সঠিক হয়, কখনোবা মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনোবা বাস্তবতার পরিপন্থী হয়। তাই এটি শরিয়তের দলিল তো নয়ই, বরং একে শরিয়তের দলিলের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরি। এমনিভাবে কাশফ ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয় যে, তা অর্জন করা শরিয়তে কাম্য হবে বা সওয়াবের কাজ হবে। কাশফ হওয়ার জন্য বুজুর্গ তো দূরের কথা মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশফ তো ইবনুস সাইয়াদের মতো দাজ্জালেরও হতো। (তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ- মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, ১৪২,১৪৩ পৃষ্ঠা)

বসতেন। খতম পড়া শুরু হতো। খতমের পর বসত কাওয়ালির আসর। বাদশাহ এক-দুটি গজল শুনে ফিরে আসতেন। ফেরার সময়ও সবাই দ্রুত তার চলার জন্য জায়গা ছেড়ে দিত।

বাহাদুর শাহ যদি বিদ্রোহে না জড়াতেন তা হলে শেষ জীবন শান্তিপূর্ণভাবেই কাটাতে পারতেন; কিন্তু বাদশাহ বিদ্রোহীদের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং জীবনের শেষদিনগুলোয় হাজারো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন।

আমার নানাজান বলেন, বাদশাহ যে-দিন লালকেল্লা থেকে বের হন সে-দিন তিনি সরাসরি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহে উপস্থিত হন। দুয়েকজন একান্ত সহচর ছাড়া তার সাথে কেউ ছিল না। বাদশাহ তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় পেরেশান ছিলেন। দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল তার চোখেমুখে। শুভ্র দাড়িগুলোও ছিল ধুলোমলিন। বাদশাহর আগমনের সংবাদ শুনে আমি দরগায় উপস্থিত হই। দেখি মাজারের দিকে দরজায় ঠেস দিয়ে বাদশাহ বসে আছেন। আমাকে দেখে তার চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। আমার সাথে কুশলবিনিময় করেন। এরপর খানিকটা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি এই বিদ্রোহীরা নিজেরাও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে। এখন তাই হয়েছে। এদের উপর বিশ্বাস রাখাই ভুল হয়েছে। ভাই, আমি এক সাদাসিধা দরবেশ-প্রকৃতির মানুষ হলেও আমার শরীরে তৈমুরি খুন বইছে। আমার মহান পূর্বপুরুষেরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যেতেন। তারা কখনো হিম্মতহারা হননি; কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি বুঝে ফেলেছি আমার নিয়তি। আমিই ভারতের বুকে মোগল প্রদীপের শেষ আলোকচ্ছটা। অযথা আর খুন ঝরাতে চাই না। কেল্লা ছেড়ে চলে এসেছি। রাজত্বের মালিক তো আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেবেন। আমার পূর্বপুরুষেরা কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত শাসন করেছেন। এখন অন্যদের সময়। আমাদের হটিয়ে তারা ক্ষমতায় বসবে। আর সত্যি বলতে কী, আমরাও তো কাউকে না কাউকে হটিয়েই ক্ষমতা বুঝে নিয়েছিলাম।

এরপর বাদশাহ আমাকে একটি ছোট সিন্দুক দিয়ে বলেন, এটি তোমায় সোপর্দ করলাম। আমির তৈমুর যখন ইস্তাম্বুল জয় করেন তখন সুলতান বায়েজিদ ইয়ালদারমের ধনভান্ডার থেকে এটি সংগ্রহ করেন।[৩]

এর মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৫টি দাড়ি আছে। আমাদের খান্দানে বরকতের জন্য একে সংরক্ষণ করা হতো। এখন তো আমার জন্য আসমান-জমিনের কোথাও কোনো জায়গা নেই। সুবিশাল ভারতভূমিও

---

[৩]. তৈমুরের সাথে সুলতান বায়েজিদের লড়াই হয় ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দে।

জাফরের জন্য আজ খুবই সংকীর্ণ। এটা তুমি নিয়ে যাও। এর জন্য তোমার চেয়ে অধিক হকদার কাউকে দেখছি না। এটা ছিল আমার চোখের প্রশান্তি। আজ একে নিজের থেকে আলাদা করে দিলাম। নানাজান সেই সিন্দুকটি দরগাহ শরিফের তোষাখানায় রেখে দেন। এখনো প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে সিন্দুকটি জনসম্মুখে আনা হয় এবং সবাই এ থেকে বরকত নেয়।

বাদশাহ নানাজানকে বললেন, আজ তিনবেলা হলো খাবার খাইনি। তোমার ঘরে কোনো খাবার থাকলে নিয়ে এসো। নানা বললেন, আমাদের ঘরেও দুশ্চিন্তা আর মৃত্যুভয়। রান্না করার সুযোগ মেলেনি। তবু ঘরে যাচ্ছি, যা পাই নিয়ে আসব। অথবা, আপনিই আমার সাথে চলুন! যতক্ষণ আমি ও আমার সন্তানেরা বেঁচে থাকবে ততক্ষণ কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আপনার কিছু করতে হলে আগে আমাদের হত্যা করতে হবে।

বাদশাহ বললেন, এটা তোমার অনুগ্রহ। তবে আমি এই বৃদ্ধ হাড়ের হেফাজতের জন্য নিজের পিরের বংশধরদের হত্যার মুখে ঠেলে দিতে পারি না। জিয়ারত করেছি। আমানতও তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন দু' লোকমা খেয়ে হুমায়ুনের সমাধির দিকে চলে যাব। তারপর তাকদিরে যা আছে, তা-ই হবে।

নানা সাহেব ঘরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঘরে কোনো খাবার আছে কি না। জবাব এলো, বেসনের রুটি ও সিরকার চাটনি আছে। একটা বড় থালায় কাপড় দিয়ে ঢেকে তা বাদশাহর সামনে আনা হলো। বাদশাহ বেসনের রুটি খেলেন এবং পানি পান করলেন। তিনবেলা অভুক্ত থাকার পর তিনি কোনো খাবার খেলেন। এরপর তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করে হুমায়ুনের সমাধির দিকে রওনা হলেন। পরে সেখান থেকেই তিনি গ্রেফতার হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। রেঙ্গুনের নির্বাসিত জীবনের তিনি একজন ধৈর্যশীল, নেককার মানুষ হিসেবেই বেঁচে ছিলেন।

এই হলো বাহাদুর শাহ জাফরের ঘটনা। জ্ঞানীদের জন্য এতে আছে শিক্ষা। এসব ঘটনা থেকে অহংকারী হৃদয়গুলো শিক্ষা গ্রহণ করে অহংকার ত্যাগ করতে পারে। আর অহংকার ত্যাগ করলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়।

দিল্লিবাজারে ভিখারি শাহজাদা

এই হলো দিল্লি। একে বলা হয় হিন্দুস্তানের দিল্। মানে হৃৎপিণ্ড। একসময় এই শহর আবাদ ছিল। লালকেল্লায় নিভু-নিভু জ্বলছিল মোগলপ্রদীপ। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল ইসলামি ঐতিহ্য। শেষের দিকে এই শহরের বাসিন্দারা বদলে গেল। তাদের আমলের খাতা শূন্য হয়ে পড়ল। পরিবর্তনটা এসেছিল শাসকদের হাত ধরে। প্রথমে তাদের আমল খারাপ হলো। তারপর শহরবাসীরা তাদের অনুসরণ করল। পরিণতিতে শাসক ও শাসিত উভয়েই বরবাদ হলো। তাদের উপর নেমে এলো মুসিবতের দমকা হাওয়া। ইতিহাসের পাতায় উদাহরণ অনেক আছে; তবে এখানে আমি শুধু একটি ঘটনাই বলব। এই ঘটনা পড়ে ভারতীয় মুসলমানদের মনে আল্লাহর ভয় জেগে উঠুক—এটাই আমার প্রত্যাশা।

বিদ্রোহের এক বছর আগের ঘটনা। দিল্লির বাইরে এক জঙ্গলে কয়েকজন শাহজাদা শিকারে ব্যস্ত ছিল। সময় ছিল মধ্যদুপুর। গাছের ডালে ডালে চড়ুই পাখি আর ঘুঘুর দল বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। খেলাচ্ছলে শাহজাদারা ঘুঘু আর চড়ুইগুলোকে নিশানা বানিয়ে গুলতি ছুড়তে লাগল। এ সময় ঝোপের আড়াল থেকে একজন শুভ্রকেশী দরবেশ বের হয়ে এলেন। 'কেন অবলা প্রাণীগুলোকে কষ্ট দিচ্ছেন প্রিয় শাহজাদা? তাদেরও আমাদের মতো অনুভূতি আছে। তারাও ব্যথা পায়। কষ্ট অনুভব করে; কিন্তু তা প্রকাশের ভাষা তাদের নেই। আপনারা তো বাদশাহর সন্তান। বাদশাহ তো তার রাজত্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি দয়াবান হবেন।' বললেন দরবেশ।

এ কথা শুনে বড় শাহজাদা—যার বয়স তখন আঠারো বছর—লজ্জিত হয়ে হাতের গুলতি রেখে দিল। ছোট শাহজাদা মির্জা নাসিরুল মুলক বিগড়ে বসল। বলল, 'আমরা তো শিকার করতে এসেছি। শিকার করা তো দোষের কিছু না।'

দরবেশ বললেন, 'জনাব, রাগ করবেন না। এমন প্রাণীই শিকার করা উচিত, যার একটা মারলে অন্তত পাঁচ-দশজন পেট ভরে খেতে পারবে। এ ধরনের ছোটোখাটো প্রাণী মেরে কী লাভ, বলুন! এমন প্রাণী বিশটা মারলেও একজন পেট ভরে খেতে পারবে না।'

দরবেশের কথা শুনে মির্জা নাসিরুল মুলক রাগে ফেটে পড়ল। গুলতি নিয়ে দরবেশের হাঁটুতে ঢিল ছুড়ে মারল। তীব্র ব্যথায় দরবেশ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। দরবেশকে পড়ে যেতে দেখে দুই শাহজাদা কেল্লার দিকে চলে গেল। দরবেশ হেঁচড়ে হেঁচড়ে পুরাতন কবরস্থানের দিকে যেতে লাগলেন। তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, 'যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা এতটা নির্দয় ও জালেম, তা আর কী করে টিকে থাকবে! শাহজাদা, তুমি আজ আমার পা ভেঙেছো, এক দিন খোদা তোমার পা-ও ভেঙে দেবেন। তুমিও সে-দিন আমার মতো হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলবে।'

তোপ গর্জাচ্ছে। একের পর এক গোলা শূন্যে উঠে আবার নিচে নেমে আসছে। সাথে নিয়ে আসছে ধ্বংস ও তাণ্ডব। চারদিকে শুধু লাশের সারি নজরে ভাসছে। দিল্লিকে জনমানবহীন লাগছে। মনে হচ্ছে মৃত মানুষের শহর। লালকেল্লার ফটক দিয়ে কয়েকজন শাহজাদাকে বের হতে দেখা গেল। শাহজাদারা ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। তারা পালাচ্ছে পাহাড়গঞ্জের দিকে। একটু পরেই বিশ-পঁচিশজন গোড়া সিপাহি তাদের ধাওয়া করল। সিপাহিরা শাহজাদাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ শাহজাদারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রক্তের মাঝে কাতরাতে থাকে তারা। সিপাহিরা এগিয়ে আসে। দেখতে পায় দুই শাহজাদা মারা গেছে। একজন বেঁচে আছে। তার গায়ে গুলি লাগেনি। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় হালকা আঘাত পেয়েছে। সিপাহিরা তাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্প ছিল পাহাড়ের উপরে। বড় অফিসার শাহজাদাকে দেখে চিনতে পারে। বাদশাহর নাতি নাসিরুল মুলক। সিপাহিদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে কয়েদ করতে।

বিদ্রোহী সিপাহিরা পরাজিত হয়ে পালাতে থাকে। ইংরেজ-বাহিনী উল্লাস করতে করতে শহরে প্রবেশ করে। বাহাদুর শাহ জাফর গ্রেফতার হলেন হুমায়ুনের সমাধি থেকে। তৈমুরি রাজত্বের শেষপ্রদীপ এভাবেই নিভে যায়। শহরের বাইরে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় সন্ত্রান্ত শহরবাসী। যে নারীদের চেহারা বাইরের কেউ দেখেনি কখনো, তারাও আজ বে-আবরু। দিল্লিতে চলছে খুনের মহোৎসব। সন্তানের সামনে পিতাকে জবাই করা হচ্ছে। কন্যাকে হত্যা করা হচ্ছে মায়ের সামনে।

এই বিশৃঙ্খল সময়ে শাহজাদা নাসিরুল মুলককে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে পাহাড়ি ক্যাম্পে। এক পাঠান সিপাহি এসে বলল, 'বড় সাহেব আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। আপনি চলে যান। আবার কোনো বিপদে পড়ার আগে এই এলাকা ছেড়ে চলে যান।'

শাহজাদার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। পাঠান সিপাহির শুকরিয়া আদায় করে সে নির্জন এলাকার দিকে রওনা হলো। শাহজাদা হাঁটছে; কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। শাহজাদা প্রায় এক মাইল হাঁটল। মৃত্যুভয় আর ক্ষুৎপিপাসায় শরীর ক্লান্ত। অনভ্যস্ত পা-দুটো আর চলতে চাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠনালীতে কাঁটার মতো বিঁধছে কিছু একটা। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত শাহজাদা এক গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। কষ্টের দু'ফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে পড়ল। 'খোদা, এ কোন মুসিবতে ফেললে আমায়? আমি এখন কোথায় যাব? কোথায় হবে আমার ঠিকানা?' এ কথা বলতে বলতে শাহজাদা আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাল। শাহজাদার চোখ পড়ল গাছের ডালে। সেখানে ঘুঘু বাসা বুনেছে। আয়েশ করে ডিমে তা দিচ্ছে। ঘুঘুর স্বাধীনতা ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন দেখে শাহজাদার মুখ থেকে বের হলো, 'ঘুঘু, তুমি আমার চেয়ে হাজারগুণ সুখে আছ। তুমি তো নিশ্চিন্তে বাসায় বসে আছ। আর আমার জন্য আসমান-জমিনের কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা নেই।'

একটু দূরে একটা বসতি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে যাওয়ার জন্য শাহজাদা উঠে দাঁড়াল। পা-দুটো চলতে চাইছে না। কোনোমতে টেনে টেনে বসতিতে পৌঁছল। বসতির বাইরে বড় একটা গাছের নিচে অনেক লোকের জটলা দেখা যাচ্ছে। গাছের নিচে চত্বরের মতো একটা জায়গায় এক কিশোরী বসে আছে। বাতাসে কিশোরীর চুল উড়ছে। তার দু'কান রক্তে রঞ্জিত। গ্রামের লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। একই সময়ে মেয়েটির সাথে মির্জার চোখাচোখি হলো। দুজনেই চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি আর কেউ না, মির্জার ছোট বোন। ভাইবোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। দিল্লির পতন আসন্ন বুঝতে পেরে মির্জার মা ও বোন রথ নিয়ে কেল্লা ছেড়ে কুতুব সাহেবের দিকে রওনা হয়। মির্জার কল্পনাতেও ছিল না যে, তার মা ও বোন কোনো বিপদে পড়তে পারে।

'বোন, তোমার এ অবস্থা কেন?' মির্জা জিজ্ঞাসা করল।

'ভাইজান, আমাদের লুটপাট করেছে। চাকরদের মেরে ফেলেছে। আম্মাকে অন্য গ্রামে নিয়ে গেছে। আমাকে এই গ্রামে আনা হয়েছে। আমার চুল ধরে টেনেছে। একের পর এক থাপ্পড় মেরেছে গালে।' বলতে বলতে শাহজাদি কেঁদে ফেলল। কান্নার গমকে তার কথা আটকে গেল। শাহজাদা বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। গ্রামবাসীদের সামনে হাত জোর করে শাহজাদিকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাল।

'আরে ভাগ এখান থেকে। নইলে এমন মার খাবি যে, কল্লা উড়ে যাবে। ওকে আমরা পাশের গ্রাম থেকে কিনে এনেছি। দাম দে, নিয়ে যা।' মাতব্বর গোছের একজন বলল।

‘চৌধুরী সাহেব, একটু রহম করো। দাম দেব কীভাবে? আমি নিজেই তো এখন ভিক্ষুক। একটু দয়া করো। গতকাল তোমরা আমাদের প্রজা ছিলে। আমরা বাদশাহ ছিলাম। আজ সময়ের চাকা উলটে গেছে। যদি আবার আমাদের দিন ফিরে আসে, তোমাদের অনেক ধনসম্পদ পুরস্কার দেব।’ শাহজাদার কথা শুনে গ্রামবাসী হেসে ফেলল।

‘তোর আর বাদশাহ হতে হবে না। তোকে এখন ইংরেজদের হাতে তুলে দেব। আর এই মেয়ে আমাদের গ্রামে থাকবে। আমাদের বাড়িঘর ঝাড়ু দেবে। ক্ষেতে কাজ করবে।’ বলল একজন।

কথাবার্তার ফাঁকেই ক’জন ইংরেজ-সৈন্য এসে গ্রামবাসীকে ঘিরে ফেলল। সামান্য কথা কাটাকাটির পর সেনারা চারজন গ্রামবাসী ও শাহজাদা-শাহজাদিকে গ্রেফতার করল।

চাঁদনিচকে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। সামনে আনা হচ্ছে সন্দেহভাজনদের। যার ব্যাপারে ইংরেজ অফিসার ফাঁসির রায় দিচ্ছে, তাকেই তাৎক্ষণিক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন শত শত লোককে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। কাউকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। দিল্লিতে শুধুই খুনের উৎসব। শাহজাদা মির্জা নাসির ও তার বোনকে বড় অফিসারের সামনে আনা হলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে অফিসার তাদের ছেড়ে দিল। মুক্তি পেয়ে দুই ভাইবোন এক সওদাগরের বাড়িতে চাকরি নিল। শাহজাদি সওদাগরের বাচ্চাদের দেখাশোনা করত আর শাহজাদা ঘরের বাজার-সদাই করত। কিছুদিন পর শাহজাদি অসুস্থ হয়ে মারা যায়। শাহজাদা আরও কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরে চাকরের কাজ করে। পরে ইংরেজ-সরকার তার জন্য মাসিক ৫ রুপি ভাতা ধার্য করে দেয়। পাশাপাশি ছোট একটা চাকরির সুবাদে মির্জার দিনগুলো কোনোমতে কেটে যাচ্ছিল।

এক বছর আগের কথা। দিল্লিবাজার, চিতলিকবর, কামরাবাঙ্গিশ-সহ বিভিন্ন এলাকায় এক বৃদ্ধ ভিখারিকে দেখা গেল। তার পা ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সে হাতে ভর করে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলাফেরা করত। গলায় ঝুলত ভিক্ষার ঝুলি। সে দু’কদম গিয়েই থেমে যেত। আশপাশের পথিকদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাত। তার চোখে ফুটে উঠত বোবা আকুতি। চেহারায় ছিল তৈমুরি বংশের ছাপ। দিল্লির অনেকেই তাকে চিনত। তাকে জিজ্ঞেস করলেই তার পরিচয় জানা যেত। তার নাম মির্জা নাসিরুল মুলক। শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের নাতি। পেনশনের সব অর্থ ঋণের কারণে শেষ করে ফেলেছে। এখন ভিক্ষার ঝুলিই হয়েছে তার শেষ সম্বল। আমি যখনই তাকে দেখতাম, তার

জীবন থেকে শিক্ষা নিতাম। আমার মনে পড়ত তার জীবনের শুরু দিকের ঘটনাবলি, যার কিছুটা আমি তার মুখে এবং কিছুটা অন্য শাহজাদাদের মুখে শুনেছি। শাহজাদাকে দিল্লির বাজারে হাতে ভর করে চলতে দেখলে আমার মনে পড়ত সেই দরবেশের কথা, যাকে শাহজাদা গুলতি মেরেছিল আর তিনি বদদোয়া করে বলেছিলেন, 'একদিন খোদা তোমার পা-ও ভেঙে দেবেন।' আমার মনে হতো সেই দরবেশের বদদোয়া কবুল হয়েছে। শাহজাদাকে দেখলেই আমি খোদার ভয়ে কাঁপতে থাকতাম। কিছুদিন আগে এই শাহজাদা ইনতেকাল করেছে।

এই সত্য ঘটনা থেকে আমাদের ধনী ভাইদের শিক্ষা নেওয়ার আছে। অহংকারীর করুণ পরিণতি তাদের সামনেই আছে। এরপরেও কি তারা অহংকার ত্যাগ করবে না?

আমি পির-মাশায়েখের সন্তানদেরও সতর্ক করতে চাই, যারা হাতের তালুতে বাবার মুরিদদের চুমু পেয়ে অভ্যস্ত। আর এটাই তাদের ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে। তাদের মনে জমা হয় অহমিকা। দুনিয়ার কাউকে তারা মানুষ মনে করে না। তারা পূর্বপুরুষের কীর্তির উপর ভরসা করে মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে। পরিণামে তারা অযোগ্যই থেকে যায়। পিরজাদাদের উচিত সেই যোগ্যতা অর্জন করা, যার কারণে তার পিতাকে পির বলা হয়। মুরিদদের হাদিয়া-তোহফার আশায় থাকা, তার উপর ভরসা করে চলা চরম আত্মমর্যাদাহীন কাজ। আমি অনেক পিরজাদাকে দেখেছি, তারা বাল্যকালেই রাজকীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাবার মুরিদদের তারা নিজেদের দাস ভাবতে শুরু করেছে। তাদের মনে রাখা উচিত, যেভাবে সময়ের পরিবর্তনে বাদশাহরা ক্ষমতা হারায় এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা হয় লাঞ্ছিত, সেভাবে পিরজাদাদের অহংকার ও বদদীনি কর্মকাণ্ড তাদের পতন ঘটাতে পারে যেকোনো সময়। এ জন্য সবার উচিত, কঠিন সময় আসার আগেই নিজের নিয়ত ও আমলের পরিবর্তন ঘটানো।

আমি এ কথাগুলোই বলছি এবং বলব, যতদিন আমার জবান ও কলম সচল থাকবে।

এতিম শাহজাদার গল্প

এই গল্প এক শাহজাদার। তার নাম মেহ আলম। সে ছিল দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের নাতি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় তার বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। মেহ আলমের পিতা মির্জা নুর রোজ হায়দার রাজবংশের অন্যান্য সদস্যের মতো মাসিক একশো রুপি ভাতা পেতেন। নুর রোজ হায়দারের মা অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ফলে নুর রোজ মাসিক ভাতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তার চলাফেরা ছিল অন্যান্য ধনী শাহজাদার মতোই।
বিদ্রোহের শুরুর দিনগুলোতে মেহ আলমের মা অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসা চলছিল; কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার কেবল অবনতিই হচ্ছিল। যে-দিন বাহাদুর শাহ জাফর কেল্লা থেকে বের হয়ে হুমায়ুনের সমাধিতে চলে গেলেন আর শহরবাসীরা পেরেশান হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল, সে-দিন মেহ আলমের মা মারা গেলেন। সময়টা ছিল চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ও চিন্তিত তখন। দোকানপাট বন্ধ। কাফনের কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। লাশ গোসল দেওয়ার লোক নেই। শাহি পরিবারের নিয়ম ছিল শাহজাদারা লাশের পাশে যাবে না। সব কাজ চাকরবাকর আর দাস-দাসীরা করবে। মোগল পরিবারে তো চাকরের অভাব ছিল না; কিন্তু অস্থির দিল্লিতে চাকরবাকররাও যে যেভাবে পেরেছে, পালিয়ে গেছে। ঘরে দুজন দাসী ছিল; কিন্তু তারা লাশ গোসল দিতে পারত না। মির্জা নুর রোজ লেখাপড়া-করা-শাহজাদা; কিন্তু তিনিও গোসল ও কাফনের নিয়ম জানেন না। এই দুশ্চিন্তার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

ইতোমধ্যে খবর এলো ইংরেজ-বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেল্লায় প্রবেশ করবে। এখন কিছু করার নেই। লাশ খাটিয়ায় রেখে গোসল দেওয়া হলো। গোসল বলতে পাত্রে পানি নিয়ে লাশের গায়ে ঢেলে দেওয়া; এই আর কী! কাফনের ব্যবস্থা নেই। অগত্যা খাটে বিছানোর দুটো পুরোনো চাদর দিয়ে লাশ মুড়িয়ে দেওয়া হলো। এবার দাফনের পালা। লাশ বাইরে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মির্জা নুর রোজ স্ত্রীর দাফন নিয়ে ভাবছেন—এই সময় কয়েকজন গোড়া ও শিখ সৈন্য ঘরে প্রবেশ করল। তারা

প্রথমেই মির্জা ও তার এগারো বছর বয়সি ছেলেকে বেঁধে ফেলল। তারপর শুরু হলো লুটপাট। সিন্দুক ও আলমারিগুলো ভেঙে ফেলা হলো। বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা হলো। দুই দাসী গোসলখানায় গিয়ে লুকাল। এক সিপাহি তাদের দেখে ফেলল। দুজনকেই চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে আনা হলো। সিপাহিদের সামনেই লাশ রাখা ছিল। তারা সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করল না। লুটপাট চালিয়ে গেল। মূল্যবান গয়নাগাটি ও অর্থকড়ি একত্র করে দুই দাসী ও পিতা-পুত্রের কাঁধে উঠিয়ে দেওয়া হলো। দুজন শিখ-সিপাহি তাদের নিয়ে পাহাড়ি ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো। মির্জা নুর রোজ শেষবারের মতো প্রিয়তমা স্ত্রীর লাশের দিকে তাকালেন। তার দু'চোখে ফুটে উঠল কষ্ট ও বিষাদ। চোখের কোনায় জমা হওয়া জল মুছে শাহজাদা সিপাহিদের সাথে হাঁটা শুরু করলেন।

দাসীরা আগে থেকেই মালপত্র বহনে অভ্যস্ত। মির্জা নুর রোজও শক্ত-সমর্থ শাহজাদা। তারা মাথায় বোঝা নিয়ে পথ চলছিল। কিন্তু মেহ আলমের বয়স কম। শারীরিকভাবেও সে ছিল দুর্বল। মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সামর্থ্যের চেয়ে বেশি ওজনের বোঝা। মেহ আলম রাত থেকেই কান্নাকাটি করছে। সে এখন ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। পিছনে সিপাহিদের তলোয়ার। সামনে অনিশ্চিত গন্তব্য। মেহ আলমের পা আর চলছে না। পুরো শরীর ঘেমে গেছে। মাথা ঘুরছে। মাঝেমধ্যে চোখের সামনে কেমন একটা কালো পর্দা ভেসে উঠেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। মেহ আলম পিতাকে বলল, 'আব্বা, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বোঝার ওজনে কাঁধ ব্যথা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে পড়ে যাব।'

পুত্রের কথা শুনে মির্জা নুর পিছন ফিরে সিপাহিদের বললেন, 'সাহেব, আমার ছেলের বোঝাটাও আমাকে দাও। সে অসুস্থ। এখুনি পড়ে যাবে।'

দুই সিপাহির একজনও মির্জার ভাষা বুঝল না। উলটো তারা ভাবল মির্জা সাহেব কোনো ফন্দি আঁটছে। এক সিপাহি মির্জা নুরের গালে চড় বসিয়েই সামনে ধাক্কা মারল। মির্জা হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি আর কিছু না বলে মেহ আলমের বোঝাটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সিপাহিরা ভাবল মির্জা আসলেই কোনো কুবুদ্ধি আঁটছে। এগিয়ে এসে মির্জাকে কয়েকটা ঘুষি মারল। বোঝাটা নিয়ে আবার মেহ আলমের কাঁধে দেওয়া হলো। এক সিপাহি মেহ আলমের গালেও চড় বসিয়ে দিল। সামলাতে না পেরে মেহ আলম মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রিয় সন্তানকে মার খেতে দেখে মির্জা প্রচণ্ড রেগে গেলেন। পিছন ফিরে এক সিপাহির নাকে ঘুষি বসিয়ে

দিলেন। সিপাহি এমন আঘাতের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। চোখের সামনেই তার নাক ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। সিপাহি নাক চেপে ধরে বসে পড়ল। অন্য সিপাহি মির্জা সাহেবের উপর তরবারির ঘা মেরে বসল। মির্জা সাহেব সময় মতো একপাশে সরে পড়লেন। তরবারি তার কোমরে সামান্য আঁচড় কেটে গেল। মির্জা সাহেব সুযোগটা কাজে লাগালেন। দ্রুত উঠে সেই সিপাহির মুখেও বিরাশি সিক্কার ঘুষি বসিয়ে দিলেন। সিপাহি পিছনে সরে গেল। ইতোমধ্যে আগের সিপাহিও সামলে নিয়েছে। দুজন একসাথে মির্জার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনই মির্জাকে মারতে থাকল। এদিকে দুই দাসী মাথার বোঝা ফেলে দ্রুত এগিয়ে এল। রাস্তা থেকে মুঠোভর্তি ধুলো তুলে নিল। ছুড়ে মারল সিপাহিদের চোখে। এই আচমকা আক্রমণের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। দুজনই কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। মির্জা সাহেব দ্রুত এক সিপাহির কোমর থেকে ছুরি খুলে তার গলায় চালিয়ে দিলেন। সিপাহির গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর অন্য সিপাহির পেটেও কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। সেও মারা গেল। মির্জা সাহেব এবার ছেলের দিকে মনোযোগ দিলেন। মেহ আলম মাটিতে পড়ে আছে। বেহুঁশ। মির্জা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। ধীরে ধীরে ছেলের চুল ধরে টানতে থাকেন। মেহ আলম চোখ মেলে তাকায়। পিতার গলা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে। মির্জা সাহেব ছেলেকে জড়িয়ে নিয়ে বসে আছেন। ইতোমধ্যে আট-দশজন শিখ সিপাহি এগিয়ে আসে। তারা দেখে তাদের বাহিনীর দুজনের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে পথের উপর। পাশেই মির্জা সাহেব বসে আছেন সন্তান কোলে নিয়ে। সিপাহিরা মির্জার কোল থেকে মেহ আলমকে কেড়ে নেয়। মির্জাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মির্জা সত্য কথাই বলেন। শুনতে শুনতে এক সিপাহি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কোমর থেকে পিস্তল বের করে মির্জার বুকে ছয়টা গুলি করে। মির্জার নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মির্জার লাশ পথের মাঝখানে পড়ে থাকে। মেহ আলম ও দুই দাসীকে পাহাড়ি ক্যাম্পে উপস্থিত করা হয়। ইংরেজরা দিল্লির নিয়ন্ত্রণ বুঝে পেলে দুই দাসীকে দুজন পাঞ্জাবি মুসলমান অফিসারের নিকট সোপর্দ করা হয়। মেহ আলমকে এক ইংরেজ অফিসারের বাসায় চাকর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সে বাসায় মেহ আলমের তেমন কোনো কষ্ট ছিল না। বাসায় আরও চাকরবাকর ছিল। ফলে মেহ আলমের উপর কাজের তেমন চাপ পড়ত না। কিছুদিন পর সেই অফিসার ইংল্যান্ড চলে যায়। মেহ আলমকে মিরাঠ ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়। আরেক ইংরেজ অফিসারের বাসায় ঠাঁই হয় তার।

এই অফিসার ছিল রগচটা। পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা নেই। কথায় কথায় মারধর করত। মেহ আলম সিদ্ধান্ত নিল যে-করে হোক এখান থেকে পালাতে পবে। এক রাতে সে ছাউনি থেকে বের হয়ে এলো। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করলে বলল, অফিসার জরুরি এক কাজে পাশের গ্রামে পাঠিয়েছেন। এভাবে মেহ আলম নিরাপদে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর অনুমান করে এক দিকে চলতে থাকল।

মেহ আলমের জন্য কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। বয়স কম। অচেনা পথ। পদে পদে গ্রেফতার হওয়ার ভয়। সবমিলিয়ে দুশ্চিন্তা ও হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মেহ আলম হাঁটা অব্যাহত রাখে। সকাল হতে হতে সে মিরাঠ থেকে তিন-চার ক্রোশ দূরে চলে যায়। সামনে একটা গ্রাম পড়ে। মেহ আলম গ্রামে প্রবেশ করে মসজিদে আশ্রয় নেয়। মোল্লা সাহেব তাকে দেখে নাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। মেহ আলম বানিয়ে বানিয়ে একটা পরিচয় বলে দেয়। পাশে এক দরবেশ কিসিমের লোক বসে ছিলেন। তিনি মেহ আলমকে ডেকে নেন। তার কাছে বাসি রুটি ছিল। সেটা মেহ আলমকে খেতে দেন। দরবেশের সহানুভূতি পেয়ে মেহ আলম তাকে আসল পরিচয় জানায়। মেহ আলমকে বুকে জড়িয়ে দরবেশ কাঁদতে থাকেন। তাকে সান্ত্বনা দেন।

'আর চিন্তা করো না। তুমি এখন থেকে আমার সাথে থাকবে। আল্লাহ রক্ষা করবেন।' দরবেশ বললেন।

দরবেশ মেহ আলমকে একটি রঙিন কোর্তা পরিয়ে দিলেন। তারপর তাকে নিয়ে রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে মেহ আলম ক্লান্ত হয়ে পড়লে দরবেশ কোনো গ্রামে প্রবেশ করে জিরিয়ে নিতেন। তবে ধীরে ধীরে মেহ আলম হাঁটায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এক সময় সেও দরবেশের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। প্রায় এক মাসের সফর শেষে তারা আজমির পৌঁছান। আজমির শরিফে দরবেশের পির সাহেবের সাথে দেখা হয়। পির সাহেব মেহ আলমের ঘটনা শুনে খুব মর্মাহত হন। পির সাহেব মুম্বাই থাকতেন। মেহ আলম ও দরবেশকে নিয়ে তিনি মুম্বাই চলে আসেন। এখানে মেহ আলম কয়েক বছর অবস্থান করে। এর মধ্যে সে কুরআন তেলাওয়াত শিখে ফেলে। কিছু মাসআলার কিতাবও পড়া হয়ে যায়। মেহ আলম নিয়মিত নামাজ-রোজার পাবন্দ করতে থাকে।

মেহ আলম বলেন, 'একদিন আমি পির সাহেবকে বললাম, আমি মুরিদ হব। তিনি বললেন, তুমি তো আমার মুরিদের মতোই। আমি বললাম, না, হজরত, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার মুরিদ হতে চাই। আমার কথা শুনে পির সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। একটু পর তিনি ধীর গলায় বলতে থাকেন,

‘মেহ আলম, পির-মুরিদি খুব কঠিন কাজ। আজকাল লোকেরা একে তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। মুরিদ হওয়াটাও এখন প্রথা হয়ে গেছে। মানুষ মুরিদ হচ্ছে; অথচ সে জানেই না মুরিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী। এ পথে হাজারো কষ্ট আর মুসিবত আসবে। এই পথ অনেক কঠিন। মানুষ আজকাল দুনিয়ার খায়েশ মেটানোর জন্য মুরিদ হচ্ছে; অথচ মুরিদ তাকেই বলা হয়, যে দুনিয়ার খায়েশ দূর করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলে। তুমি মুরিদ হওয়ার আগে আরেকটু ভেবে দেখো। নিজেকে প্রশ্ন করো, তুমি মুরিদ হতে প্রস্তুত কি না?’

সুলতানা বানুর দুঃখগাথা

সিপাহি বিদ্রোহের পর ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এখনো আমার মনে হয় এ যেন গতকালের কাহিনি। বিদ্রোহের সময় আমার বয়স ছিল ষোলো-সতেরো বছর। আমার ভাই ইয়াদর শাহ আমার দুই বছরের বড়। আমার বোন নাজ বানুর চেয়ে আমি ছয় বছরের বড়। আমার নাম সুলতানা বানু। আমার বাবা মির্জা কোয়াইশ বাহাদুর।

ভাইজান আমাকে খুব মহব্বত করতেন। আমরা একে অপরের জন্য ফিদা ছিলাম। ভাইজানের জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কেউ হাফেজ। কেউ মৌলবি। কেউবা হাতের লেখা শেখাতেন। আবার কেউ শেখাতেন তিরন্দাজি। আমরা অন্দরমহলে সেলাইকর্ম শিখতাম। হুজুর জিল্লে সুবহানি[৪] আমাদের খুব আদর করতেন। মহলে নিয়ম ছিল, হুজুর যাদের আদর করেন, তারা সকালের নাশতা বাদশাহর খাস কামরায় শাহি দস্তরখানে খাবে। বাদশাহ আমাকে অনেক আদর করতেন। প্রায়ই সকালে আমাকে তার কামরায় ডেকে নিতেন। নিয়ম ছিল, বাদশাহ কাউকে ডাকলে সে 'জায়ে আদবে' দাঁড়িয়ে বাদশাহকে তিনবার সালাম দেবে। বাদশাহ একবার আমাকে ডেকেছিলেন। সে-দিন প্রাসাদে নতুন একটি ইরানি খাবার প্রস্তুত করা হয়। বাদশাহ আমাকে খেতে ডাকেন। আমি বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিই। বাদশাহ আমার হাতে খাবারের পাত্র তুলে দিয়ে বলেন, 'সুলতানা, তুমি তো কিছুই খাও না। সবার আগে দস্তরখান থেকে উঠে যাও। এটা ঠিক না।'

আহা, কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! আমাদের মাথার উপর ছিল বাদশাহর ছায়া। আমরা যেখানে যেতাম, লোকে আমাদের মালিকা বলে সম্বোধন করত। আমরা নিশ্চিন্তে ও ফুরফুরে মেজাজে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতাম।

এখনো মনে পড়ে সেদিনের কথা, যে-দিন বাহাদুর শাহ জাফর হুমায়ুনের সমাধি থেকে গ্রেফতার হন। আমার চাচা মির্জা আবু বকর বাহাদুরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চাচাতো ভাই মির্জা সোহরাব একদিকে পালাতে চেষ্টা করে। তাকেও গুলি করা হয়। সে আহ করে চিৎকার দিয়ে চাচার লাশের উপর

[৪]. বাহাদুর শাহ জাফরকে সম্মান করে এ নামে ডাকা হতো।

পড়ে। আমার চোখের সামনেই এসব ঘটে। আমি বোবা হয়ে এই দৃশ্য দেখি। এ সময় এক বৃদ্ধ ভৃত্য এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে টান দেয়। 'বেগম এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার আব্বা আপনাকে ডাকছেন'—এ কথা বলে সে আমাকে দিয়াই[৫] দরজার পাশে নিয়ে যায়। দেখি দরজার সামনে আব্বা ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। মাথায় টুপি নেই। চেহারা ধুলোমলিন। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'সুলতানা, আমি যাচ্ছি। একটু আগে নিজের জোয়ান ছেলেকে চোখের সামনে গুলি খেয়ে মরতে দেখলাম। এবার আমার পালা। আমি তাই পালাচ্ছি।' আব্বার কথা শুনে আমি চিৎকার করে কেঁদে ফেললাম। প্রিয় ভাইয়ের সাথে কাটানো সময়গুলো চোখের সামনে ভাসছে। আব্বা আমাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেন। 'বেটি, আমি এখন যাচ্ছি। ইংরেজ সিপাহিরা আমাকে খুঁজছে। একদিন তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। তোমরা এখন খাজার সাথে যাও। সে তোমাদের নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাবে। সেখানে আমাদের বংশের অন্যদের পাবে। তোমাদের একা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না; কিন্তু উপায় নেই। আমি সাথে থাকলে তোমাদের বিপদ আরও বেড়ে যাবে। বেটি, তুমি এখন বড় হয়েছ। নাজ বানুকে দেখে রেখো। মনে রেখো এখন তোমরা শাহজাদি নও। কিছুর জন্য জেদ ধরবে না। কষ্টের সময় সবর করবে।' এসব বলে বাবা আমাদের দু'বোনকে চুমু খান। তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে এক দিকে রওনা হয়ে যান। আর কখনো তার সাথে আমার দেখা হয়নি। জানা নেই তার ভাগ্যে কী ঘটেছিল।

পুরোনো ভৃত্য খাজা আমাদের নিয়ে পথ চলতে থাকে। আমরা দুই বোন হাঁটতে থাকি। আমাদের হাঁটার অভ্যাস নাই। পা সায় দিচ্ছে না। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে হাঁটছি। নাজ বানু একটু পরপর হোঁচট খাচ্ছে। আচমকা তার পায়ে কাঁটা বিঁধল। নাজ বানু উহ্ করে উঠল। আমি ঝুঁকে তার পা থেকে কাঁটা খুলে ফেললাম।

'আপু, আমি আর হাঁটতে পারছি না। কাউকে বলে মহল থেকে একটা পালকি আনিয়ে দাও-না!' নাজ বানু বলল। ছোট বোনের কথা শুনে আমার চোখে অশ্রু জমা হলো। বুকের ব্যথা বুকে চেপে তাকে সান্ত্বনা দিলাম। এদিকে খাজা তাড়া দিচ্ছে দ্রুত চলার জন্য। নাজ বানুর অবস্থার দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। নাজ বানু একটু জেদি মেয়ে। সবসময় চাকরবাকরদের ধমক দিয়ে অভ্যস্ত। সে খাজাকে ধমক দিয়ে বসল। তারপর যা ঘটল তার জন্য আমরা দু'বোন একদম প্রস্তুত ছিলাম না। খাজা সজোরে নাজ বানুর গালে চড় বসিয়ে

---

[৫]. দিল্লি শহরে প্রবেশের একটি ফটক।

দিল। নাজ বানু, আমার আদরের ছোট বোন, যার গায়ে ফুলের টোকাও লাগেনি কখনো, সে চড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। বোনের কান্না দেখে আমারও কান্না চলে এলো। বোনকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকি। এই ফাঁকে খাজা আমাদের রেখে সটকে পড়ে। আমরা দু'বোন অনেক কষ্টে হেঁটে হেঁটে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহে পৌঁছাই। সেখানে আমাদের খান্দানের অন্যদের সাথেও দেখা হয়; কিন্তু সবাই তখন নিজের জীবন নিয়েই শঙ্কিত। কেউ আমাদের সাথে কথা বলেনি। কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। এ যেন কিয়ামতের বিভীষিকা। ক'দিন পর নাজ বানু মারা যায়। আমি একা হয়ে যাই। আমার দিনগুলো খুবই কষ্টে কাটতে থাকে। কিছুদিন পর ইংরেজ-সরকার আমার জন্য মাসিক ৫ রুপি ভাতা নির্ধারণ করে। সেই ভাতা এখনো চলছে। এখন এভাবেই বেঁচে আছি।

অভুক্ত শাহজাদার রোজা

রমজানের মাঝামাঝি একদিন। শাহজাদা মির্জা সেলিম বাহাদুর[৬] তাদের মহলের সামনে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় অন্দরমহল থেকে এক দাসী বাইরে এলো। 'হুজুর, বেগম সাহেবা আপনাকে ডেকেছেন।' বিনয়ের সাথে বলল দাসী। মির্জা সেলিম উঠে ভিতরে গেলেন। একটু পর তিনি ফিরে এলেন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।' এক বন্ধু বলল।

'না, তেমন কিছু না। অনেক সময় আম্মা অযথা রাগ করেন। গতকাল ইফতারির সময় নথন খান গান গাইছিল। আমিও মাঝেমধ্যে সুর দিচ্ছিলাম। আম্মা তখন কুরআন পড়ছিলেন। আমাদের শোরগোল তার ভালো লাগেনি। এখন আমাকে ডেকে বললেন, রমজানে কোনো গান-বাজনার আসর বসতে পারবে না। সম্মান করে আমি তার কথা মেনে নিয়েছি। কিন্তু গান-বাজনা ছাড়া আমি কীভাবে থাকব, বলো? আরও পনেরো-ষোলো দিন আছে রমজান শেষ হতে।' বলতে বলতে শাহজাদার চেহারায় বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে।

'এক কাজ করা যায়। প্রতিদিন ইফতারির আগে আমরা জামে মসজিদে যেতে পারি। সেখানে তখন নানা জাতের, নানা ধরনের মানুষ জমা হয়। এক আজিব দৃশ্যের অবতারণা হয়। খুব ভালো লাগবে তোমার। সময়টাও ভালো কাটবে।' এক বন্ধু বলল। বন্ধুর কথা মির্জা সেলিমের পছন্দ হলো। পরদিন বিকেলে তিনি বন্ধুদের নিয়ে জামে মসজিদে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক মুগ্ধকর দৃশ্য। মসজিদের প্রশস্ত আঙিনায় জটলা করে বসে আছে লোকজন। আলাপসালাপ চলছে। কেউ একা-একা কুরআন তেলাওয়াত করছে। রাতে তারাবি পড়াবে যে-সকল হাফেজ, তারা দুজন দুজন করে বসে একে অপরের তেলাওয়াত শুনছে। একপাশে দুজন আলেম বসে একটি ফিকহি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করছেন। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছে আরও ২০-২৫ জন। বারান্দার এক কোনায়—সেখানটায় ভিড় কম—কয়েকজন বসে মোরাকাবা

---

৬. মির্জা সেলিম বাহাদুর ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের ভাই। বিদ্রোহের পূর্বে তিনি গ্রেফতার হয়ে এলাহাবাদে যান।

করছে। পাশে বসে অজিফা আদায় করছে এক-দুজন। মসজিদের সর্বত্র ইবাদতের দৃশ্য। মালিকের সাথে গোলামের সম্পর্ক স্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা।

ইফতারের সময় হয়ে এলো। লোকজন ইফতার নিয়ে মসজিদে আসছে। মুসল্লিদের মধ্যে বণ্টন করছে। সুলতানি মহল থেকে প্রচুর ইফতার পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া শহরের আমির-উজিররাও ইফতার পাঠিয়েছেন। সবার ভিতর গোপন প্রতিযোগিতা চলছে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার। চাকররা পিতলের বড় থালায় করে ইফতারি নিয়ে আসছে। থালার উপর রং-বেরঙের কাপড় দিয়ে খাবার ঢেকে রাখা হয়েছে। সদ্য রান্না-করা খাবারের সুবাস ছড়িয়ে পড়লে চারপাশে। লোকজন হাসিমুখে ইফতার বণ্টন করছে। এই দৃশ্য, এই মৃদু কোলাহল মির্জা সেলিমের মনে রেখাপাত করে। তিনি প্রতিদিন মসজিদে আসা-যাওয়া শুরু করেন।

মির্জা সেলিমের এক ভাগনে ছিল। তার নাম মির্জা শাজর। অল্প বয়সি হওয়ায় তার বেশিরভাগ সময় মামার সাথেই কাটত। তার বর্ণনা হলো, একটা সময় ছিল, যাকে আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়, সেই সময়টা হারিয়ে গেল। একটা সময় এলো, যখন দিল্লি বরবাদ হলো। আমিরদের ফাঁসিতে লটকানো হলো। তাদের খাস মহলগুলো হলো নির্জন। তাদের বেগমরা চাকরানির কাজ খুঁজতে বাধ্য হলো। মুসলমানদের ঐতিহ্যের এই ভূমি হয়ে গেল বিরান। বিদ্রোহের পর একবার শাহি মসজিদে গিয়েছিলাম। দেখলাম মসজিদের চত্বরে অনেকগুলো চুলা বসানো হয়েছে। সিপাহিদের খাবার রান্না করা হচ্ছে। একপাশে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা আছে। তাদের দানাপানি দেওয়া হচ্ছে। শাহজাহানের স্মৃতিবিজড়িত এই মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হয়েছে। কিছুদিন পর সরকার মসজিদটি মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়। তখন একবার রমজান মাসে মসজিদে গেলাম। মসজিদের চত্বরে ময়লা কাপড়-পরা কিছুলোক বসে আছে। তাদের চেহারায় মলিনতার ছাপ। দুয়েকজন কুরআন তেলাওয়াত করছে। সবকিছু কেমন নিষ্প্রাণ ও নির্জীব ঠেকল। ইফতারির সময় হলো। কিছু খেজুর বিলি করা হলো। একজন রান্না-করা-তরকারি নিয়ে এসেছে। সেগুলোও বণ্টন করা হলো। আগের মতো বাহারি খাবার নেই। মানুষের সেই আবেগ-উদ্যমও হারিয়ে গেছে। মনে হলো দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কিছু লোক একত্র হয়েছে খাবারের আশায়। মানুষ কত বদলে গেছে। আজকাল তো মুসলমানদের শিক্ষিতশ্রেণিকে মসজিদে আসতেই দেখা যায় না। গরিবেরা যা-ও একটু-আধটু মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখে; কিন্তু সেই রওনক, সেই ঐশ্বর্য কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখনো যদি মসজিদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তবে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে।